রাতকানা

সুব্রত রায়

এই গল্পটা আমার শিবুদার কাছ থেকে শোনা। শিবুদা আমার দাদার সঙ্গে কলেজে পড়তেন। সে প্রায় পাঁচ দশক আগেকার কথা। আমি তাঁকে চিনতাম না। বছর দশেক আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো অদ্ভুত ভাবে। পরিচয় হলো বললে ভুল হবে। শিবুদাই পরিচয় করে নিলেন। তারিখটা মনে আছে - তেসরা ফেব্রুয়ারি। আমার সেদিন সারাদিন কেটেছে সি-এ-বি ক্লাব হাউসে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরছি। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে বেশ ভিড়। ট্রেন আসতে কোনো রকমে ঠেলে ঠুলে ভিতরে গিয়ে রড ধরে দাঁড়াবার জায়গা করে নিলাম। আমারই মতন এক ভদ্রলোক ধাক্কা খেতে খেতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি মৃদু হেসে আমাকে বললেন - আমার নাম শিবপ্রসাদ বোস। আমি তোমার দাদার সঙ্গে কলেজে পড়তাম। বুঝলাম ভদ্রলোকও সি-এ-বি ক্লাব হাউস ফেরত। কেউ আমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। না হলে শিবুদার আমাকে চেনার কোনো কারণ নেই। ট্রেনে দু-একটা কি কথা হয়েছিলো আজ মনে নেই। শিবুদা আমার আগের স্টেশনে নেমে গেলেন।

আমাদের বাড়ি থেকে শিবুদার বাড়ির দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার, এক বাসে আসা যায় না। শিবুদা এরপর মাঝে মাঝে সকাল বেলায় আমাদের বাড়ি আসা সুরু করলেন। শিবুদার একটা গুণ গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা। একটা ছুটির দিনের কথা মনে আছে। সকালবেলায় সাড়ে সাতটা নাগাদ এসেছেন। গল্প করতে করতে সাড়ে দশটা বেজে গেছে। হঠাৎ বললেন - এই যা সকালে পাঁউরুটি কিনতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। একটু দেরি হয়ে গেলো। শিবুদা গল্পটা শেষ করলেন। আমি বললাম - এই গল্পটা বাণীবৌদিকে বলেছেন? শিবুদা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন - তোমাকে গল্পটা লেখার অনুমতি দিলাম। তুমি একটু রঙ চড়াবে জানি। কিন্তু দেখো গল্পের মূল সুরটা যেন কেটে না যায়।

(২)

মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে শিবুদা এখানে ওখানে দু-এক জায়গায় চাকরি করে সত্তর দশকের প্রথম দিকে রাঁচির হেভি এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় যোগ দেন। স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মহলানবিশ-মডেল অনুসরণ করে ভারি শিল্পের দিকে জোর দেয়। তারই ফসল রাঁচির হেভি এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় এই কারখানা তৈরি হয়। এই কারখানা তৈরির সময় একদল রাশিয়ান এঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদ উপদেষ্টা হিসাবে রাঁচিতে আসে। এদের বেশিরভাগই রাশিয়ান ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতো না। ফলে এদের সঙ্গে একদল সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় চৌকাঠ পার হওয়া তরুণী দোভাষী হিসাবে রাঁচিতে আসে। বড় বড় বসদের একজন করে দোভাষী দেওয়া হয়। যে

সব বিভাগে রাশিয়ানদের সঙ্গে প্রায়ই মিটিং করতে হতো তাদের জন্যও ছিল একজন নির্দিষ্ট দোভাষী। অন্যরা যখন যেমন দরকার সেই মতো দোভাষী-পুল থেকে একজনকে ডেকে নিতো। শিবুদা ডিজাইন সেকশনে কাজ করতেন। লেরা সেই সেকশনের দোভাষী শিবুদার পাশের টেবিলে বসতো। লেরা মোটামুটি ভালো ইংরাজি জানতো। ডিজাইন সেকশনের প্রধান মঙ্গল শ্রীবাস্তবের জন্য নির্দিষ্ট দোভাষী লুডমিলা শ্রীবাস্তবের ঘরের লাগোয়া একটা ঘরে তার সেক্রেটারির সঙ্গে বসতো। কাজের সুবিধার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ অফিসের ছুটির পর রাশিয়ান ভাষা শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। শিবুদা সেই ক্লাসে ভর্তি হয়ে মাস ছয়েকের মধ্যে মোটামুটি কাজ চালাবার মত রাশিয়ান ভাষা আয়ত্ত করে ফেললেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিবুদা লেরার সঙ্গে গল্প করতেন প্রধানত রাশিয়ান ভাষায় সড়গড় হবার জন্য। শিবুদার কথা থেকে মনে হয় এই সময় তাঁর মনে একটু রঙ লেগেছিলো। শিবুদা মাঝে মাঝে হোম-টাক্সের খাতা লেরাকে দেখিয়ে নিতেন। শ্রীবাস্তব একদিন কথায় কথায় শিবুদাকে বললেন - বোস তুমি দেখছি রুশ ভাষা বেশ ভালো করে শিখে ফেলেছো। ফাঁক পেলেই দেখি তুমি লেরার সঙ্গে গল্প করছো। একজনের সঙ্গে না মিশে সকলের সঙ্গে মিশলে বোধহয় তোমার রুশ ভাষার উপর দখল আরও ভালো হবে। শিবুদা কথাটা শুনেও শুনলেন না।

মস্কোর কর্তারা একটা জিনিষ খুব নিয়ম করে মেনে চলতেন। কাউকে বেশিদিন এদেশে রাখতেন না। কিছুদিন পর পর একদল রাশিয়ান দেশে ফিরে যেত, আর তাদের জায়গায় আর একদল রাশিয়া থেকে আসতো। একদিন লেরা এসে বললো - মস্কো থেকে তার ডাক এসে গেছে। সামনের শনিবার রাঁচি থেকে চলে যাবে। শিবুদার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। এই এক বছরে তাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠেছিলো। শুক্রবার সকালে লেরা এসে বললো - বোস, আমার একটা ছোটো সমস্যা হয়েছে। তুমি হয়তো সাহায্য করতে পারবে। শিবুদা বললেন - বলো আমি কি করতে পারি? লেরা বললো - আমি এখান থেকে দিল্লি যাবো। সেখান থেকে মস্কোর প্লেন ধরবো। দিল্লিতে আমার কয়েকটা জিনিষ কিনতে হবে। আমার হাতে যা টাকা আছে তার সঙ্গে আর চারশোটা টাকা লাগবে। তুমি যদি আমার এই কিয়েভ ক্যামেরাটা রেখে চারশোটা টাকা দাও তাহলে আমার বড় উপকার হয়। ছবি তোলার ব্যাপারে শিবুদার রাঁচিতে খুব নাম ছিল। অনেক ছুটির দিনে শিবুদা ক্যামেরা ঘাড়ে করে রাঁচির আশেপাশে ছবি তুলতে বার হতেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন কারখানা দেখতে আসেন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শিবুদাকে ডেকে বলেছিলেন - বোস, আমাদের কারখানার ফটোগ্রাফার ছবি তুলবে। আমি চাই তুমিও ছবি তোলো। আমি সিক্যুরিটি অফিসারকে বলে দিচ্ছি। তোমাকে স্পেশাল পাস দিয়ে দেবে। শিবুদা লেরাকে এই ক্যামেরাটা দিয়ে অনেকবার ছবি তুলতে দেখেছেন। অনেকবার লেরাকে বলতে শুনেছেন ক্যামেরাটা তার খুব প্রিয়। শিবুদা এক মুহূর্ত ভেবে বললেন - তোমাকে আমি চারশোটা টাকা দিচ্ছি। ক্যামেরাটা তুমি রেখে দাও। লেরা খুশি হয়ে বললো - আমাদের লোকজনেরা প্রায়ই যাতায়াত করে। তাদের কারুর হাত দিয়ে আমি টাকাটা তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। শনিবার শিবুদা লেরাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন। সোমবার রোজকার

মতো অফিসে গেলেন। লাঞ্চের ঠিক আগে ওয়ার্কশপের রাঘবন শিবুদার ঘরে এসে বললো - বোস, এই ক্যামেরাটা একটু দেখবে? শাটারটা কাজ করছে না মনে হচ্ছে। শিবুদা তাকিয়ে দেখলেন সেই চেনা কিয়েভ ক্যামেরা যেটা লেরা তাকে বিক্রি করতে চেয়েছিলো। রঘু এ ক্যামেরাটা তুমি কোথায় পেলে - শিবুদা জিজ্ঞাসা করলেন। রাঘবন বললো - শুক্রবার লেরা আমার কাছে এসে বললো তার পাঁচশোটা টাকার খুব দরকার। তার বদলে ও আমাকে এই ক্যামেরাটা দিয়ে দিলো। শিবুদা ক্যামেরাটা নাড়াচাড়া করে বললেন - শাটার জ্যাম হয়ে গেছে। আমার বিদ্যার বাইরে। দোকানে গিয়ে দেখতে পারো। স্পেয়ার পাওয়া শক্ত। মনে হয় ক্যামেরাটা আর ব্যবহার করা যাবে না। রাঘবন গজ গজ করতে করতে চলে গেল। কেউই লক্ষ্য করেনি লুডমিলা এতক্ষণ দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। রাঘবন বেরিয়ে যেতে সে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলো। শিবুদা দু-হাত জড়ো করে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। লেরা চলে যাওয়ায় তোমার মন খুব খারাপ - লুডমিলা জিজ্ঞাসা করলো। শিবুদা প্রথমে জবাব দিলেন না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন - ভাবতে কেমন লাগছে, লেরা আমাদের দুজনকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে গেলো। লুডমিলা বললো - আমি আর লেরা এক দেশ থেকে এসেছি। একই কাজ করি। তাই ওঁর সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করা শোভন নয়। তাও তোমাকে বলছি, লেরা মোটেই ভালো মেয়ে নয়। আমার সোজাসুজি তোমায় বলা ভালো দেখায় না। আমি তোমাকে শ্রীবাস্তবের মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি হয় বোঝোনি নয় বুঝেও শ্রীবাস্তবের কথায় কান দাও নি। যাকগে মাত্র চারশো টাকার উপর দিয়ে গেছে। মন খারাপ কোরো না।

আগে লুডমিলা মাঝে মাঝে শিবুদার ঘরে আসতো। লেরা চলে যাবার পর তার আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। মাস কয়েক পর লুডমিলা একদিন এলো, বললো - বোস, আমাকে এবার দেশে ফিরতে হবে। পরশু আমি চলে যাচ্ছি। শিবুদা কোনো জবাব দিলেন না। লুডমিলা শিবুদার আর একটু কাছে এসে বললো - তোমার যদি রাশিয়া থেকে ছোটোখাটো কোনো জিনিষের প্রয়োজন থাকে আমাকে বলো। আমি সম্ভব হলে পাঠাবার চেষ্টা করবো। শিবুদা লুডমিলার দিকে না তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন - আমার কিছু চাই না। আর রাশিয়ান মেয়েদের তো আমার চেনা হয়ে গেছে। লুডমিলা রাগ করলো না। আস্তে আস্তে বললো - শোনো, কাল আমি আবার আসবো। তুমি ভেবে দেখো। শিবুদা আবার বললেন - না না, আমার কিছু লাগবে না।

সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে লেটার বক্স খুলে শিবুদা দেখলেন কলকাতা থেকে তার ছোটবেলার বন্ধু স্বদেশের চিঠি এসেছে। স্বদেশ রাতে চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু দিনের বেলায় দেখার কোনো অসুবিধা নেই। কলকাতায় অনেক চিকিৎসা হয়েছে। খুব কিছু উপকার হয় নি। ডঃ বিশ্বাস বলেছেন রাশিয়ানরা একটা ইঞ্জেকশন বার করেছে। তার নাম ফিবস্। এই ইঞ্জেকশন নিয়ে বেশ কয়েকজন রাতকানা ভালো হয়ে গেছে।

পরদিন লুডমিলা আবার এলো, বললো - বোস আমি কাল চলে যাচ্ছি। তোমাকে যা বলেছিলাম। তোমার কিছু প্রয়োজন থাকলে বলো। আমি পাঠাবার চেষ্টা করবো। শিবুদা একটু দোটানায় পড়লেন। গতকাল লুডমিলাকে শক্ত কথা বলেছেন। আর বাড়ি গিয়ে পেয়েছেন ছোটবেলার বন্ধুর ওষুধ জোগাড় করে দেবার অনুরোধ। লুডমিলা আবার বললো - বোস সংকোচ কোরো না। বলো তোমার জন্য কি করতে পারি? একটু ইতস্তত করে শিবুদা বললেন - আমার এক বন্ধু রাতকানা। রাশিয়ানরা ফিবস্ নামে একটা ইঞ্জেকশন বার করেছে। এক কোর্স ফিবস্ ইঞ্জেকশন পেলে এখানকার ডাক্তাররা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। লুডমিলা বললো - আমি কথা দিচ্ছি না। কিন্তু আমি চেষ্টা করবো।

(৩)

এরপর মাস ছয়েক কেটে গেছে। কাজের ভীষণ চাপ। প্রোজেক্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার তাড়া। শিবুদার মাথা থেকে লেরা, লুডমিলা প্রায় বার হয়ে গেছে। গতানুগতিক ভাবে রাশিয়ানদের আসা যাওয়া চলছে। এবার ওদের চিফ দেশে ফিরে গেলেন। তার বদলে আর একজন এলেন, নাম ইভানভ। ইভানভ আসার পর দু-তিন দিন পার হয়ে গেছে। ইভানভের সঙ্গে শিবুদার সরাসরি কাজের যোগাযোগ নেই। একদিন দুপুর বেলায় করিডোরে দুজনে মুখোমুখি হলেন।

- আপনি বোধহয় মিস্টার বোস?
- আপনার অনুমান সত্য।
- আপনি কি অনুগ্রহ করে আমার ঘরে একবার এখন আসতে পারেন?

শিবুদা ইভানভের পিছন পিছন তাঁর ঘরে ঢুকলেন। বড় ঘর। জানলার পাশে ইভানভের বসবার জায়গা। ঘরের মাঝখানে মিটিং করার জন্য ডিম্বাকৃতি টেবিল। তার চার দিকে চেয়ার। ইভানভ তার ড্রয়ার খুলে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া একটা প্যাকেট বার করলেন।

- এই প্যাকেটটা আপনার জন্য। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কেমন করে এই প্যাকেটটা আমার হাতে এলো। এর মধ্যে কি আছে আমি জানিনা। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে আপনার হাতে পৌঁছে দেবার জন্য। আর বলা হয়েছে আপনি প্যাকেটটা খুললেই সব বুঝতে পারবেন।

শিবুদা ইভানভকে ধন্যবাদ দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলেন। সাইকেলে যাতায়াত করার জন্য শিবুদা পিঠে একটা ব্যাগ ব্যবহার করে থাকেন। তাতে হাত দুটো খালি থাকে। শিবুদা ব্যাগের মধ্যে প্যাকেটটা রেখে নিজের কাজে বসে গেলেন।

ছুটি হলে সাইকেল চালিয়ে শিবুদা বাড়ি যান। জামাকাপড় বদল কোরে এক-মগ চা খেয়ে লম্বা হয়ে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। রাতে নিয়মিত আকাশবাণীর খবর শুনে রাত দশটার কিছু পরে

খাবার গরম কোরে খেয়ে শুতে যান। আজ খবর শুনতে শুনতে শিবুদার হঠাৎ প্যাকেটটার কথা মনে পড়লো। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা বার করলেন। খবরের কাগজ ছিঁড়ে দেখলেন একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্সটার উপরে একটা ভাঁজ করা কাগজ। তার নিচে ছত্রিশটা ফিবস্-এর অ্যাম্পুল। শিবুদা ভাঁজ করা কাগজটা খুললেন। একটা সম্বোধন-বিহীন, স্বাক্ষর-বিহীন চিঠি।

"দেশে ফিরে মাস খানেক লেগে গেলো থিতু হয়ে বসতে। তারপর তোমার ওষুধের খোঁজ করতে বের হলাম। দেখলাম যতটা সহজ ভেবেছিলাম ওষুধ জোগাড় করার কাজটা তত সহজ নয়। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। রাতকানা ব্যাপারটা কি ভালো করে জানতাম না। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে, বই-পত্তর ঘেঁটে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলাম। রাতকানাদের আচার ব্যবহার, হাবভাব নকল করতে শিখলাম। তারপর একদিন হাসপাতালে হাজির হলাম চিকিৎসার জন্য। একজন তরুণ ডাক্তার পরীক্ষা করলো। অভিনয়টা নিশ্চয়ই নিখুঁত হয়েছিলো। যাইহোক এই ডাক্তারের কাছে যাওয়া আসা ও তার সঙ্গে আমার অভিনয় বেশ কিছুদিন চললো। এই আসা যাওয়া করতে করতে ডাক্তারের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। কথায় কথায় ডাক্তারকে বললাম, শুনেছি ফিবস্ ইঞ্জেকশন দিলে নাকি রাতকানারা ভালো হয়ে উঠতে পারে। ডাক্তার বললো, নতুন ওষুধ। চেষ্টা করা যেতে পারে। ভেবে দেখি। একদিন ডাক্তার প্রস্তাব দিলো, চলো না এই সপ্তাহ শেষে কোথাও বেড়িয়ে আসি। আমি রাজি হয়ে গেলাম। সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে করতে খেয়াল নেই কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ডাক্তার আমাকে বললো, চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি বললাম, দরকার নেই। নিজেই যেতে পারবো। ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললো, তাহলে বোঝা যাচ্ছে রাতকানার রোগ সারাতে ওষুধ লাগে না। ডাক্তার পাশে থাকলেই কাজ হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারলাম মুহূর্তের ভুলে আমার অভিনয় ধরা পড়ে গেছে। বাধ্য হয়ে ডাক্তারকে সব খুলে বললাম। ডাক্তার কিছু বললো না। আমাকে বাসে তুলে দিয়ে হাসপাতালে ফিরে গেলো। সোমবার আমি হাসপাতালে গেলাম। উদ্দেশ্য এতদিনের অভিনয়ের জন্য ডাক্তারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ডাক্তার আমাকে সে সুযোগ দিলো না। বললো, আমি তোমার বন্ধুর কথা ভেবে প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি। তুমি ফার্মেসি থেকে এক কোর্স ফিবস্ ইঞ্জেকশন নিয়ে নাও।

আশা করি তোমার বন্ধু সুস্থ হয়ে উঠবে। এবার হয়তো বিশ্বাস করবে সব রুশ মেয়ে লেরা নয়।

আর একটা কথা। আগামী মাসের বারো তারিখে ঐ ডাক্তারের সঙ্গে আমার বিয়ে। আমি জানি তোমার পক্ষে সেই অনুষ্ঠানে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আসতে পারতে তাহলে আমি সত্যিই খুশি হতাম"।

শিবুদা ঘর থেকে ধীর পায়ে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। দোতলা থেকে সামনের সোজা রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, যদিও রাস্তার আলো তেমন উজ্জ্বল নয়। রাত হয়ে গেছে। রাস্তা একদম ফাঁকা। বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন - বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে না পারি, মনকে সেদিন মস্কোর উপকণ্ঠে সেই ছোট্ট শহরে নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই পারবো।

December 2011